যুগান্তর

তারিখ 25 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কৃতকার্য শহরে ৮৮ গ্রামে ৪৪ ভাগ

শহর ও গ্রামে শিক্ষার মানে পার্থক্য আকাশ-পাতাল

মুসতাক আহমদ

শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষার মানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। যেখানে পাবলিক পরীক্ষায় শহরের প্রতিষ্ঠানে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর গড়ে ৮৮ ভাগ উত্তীর্ণ হয়, সেখানে গ্রামের মাত্র ৪৪ ভাগ সফলতার মুখ দেখে। আবার শিক্ষার মানের বৈষম্য এবং পাসের নিম্নমুখিতাও দিন দিন বাড়ছে। ২০০৮ সালে কেবল রাজশাহী বোর্ডে যেখানে শুধু ইংরেজিতে ৭১ ভাগ পাস করেছিল, একই বোর্ডে সেখানে এবার (২০০৯ সালে) ৮ ভাগ কম বা ৬৩ ভাগ এ বিষয়ে পাস করেছে। ফি বছর যে সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে তার মধ্যে প্রায় ৯৩ ভাগই ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করে থাকে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গ্রামের

পার্থক্য : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৬

পার্থক্য : মানের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক খারাপ করা এবং ফেল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে গিয়ে সরকার এ চিত্র পেয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে মন্ত্রণালয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পাসের এ হারের নিম্নমুখিতাকে শিক্ষার মানের অধোগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক বুধবার জানান, সাত কারণে শিক্ষার মানের বৈপরীত্য ও বৈষম্য এবং পাসের নিম্নমুখিতা বাড়ছে। এগুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে ইংরেজি-অংকের শিক্ষক সংকট। আর শহর-গ্রামের স্কুলের পাসের হারের বিপরীত চিত্রের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, শহরে ছেঁকে ছেঁকে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং পরীক্ষায় পাঠানো হয়। কিন্তু গ্রামের স্কুলে এগুলো করা সম্ভব হয় না। সামাজিক চাপ আর দায়িত্বশীলতা অথবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বাড়ানোর প্রবণতা— যে কারণেই হোক গ্রামের স্কুলে সব ধরনের শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হয়। যা শহরের প্রতিষ্ঠানকে বলতে গেলে করতেই হয় না। তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকেন যে গ্রামের স্কুলে মানসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আসলে দক্ষতা আর মানের চেয়েও বড় প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ শিক্ষক আছে কিনা। থাকলে পরে মান আর দক্ষতার প্রসঙ্গ আসবে।

আন্তঃবোর্ডের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার কম বা নিম্নমুখিতার যে সাত কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— গণিত-ইংরেজির শিক্ষক সংকট, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক একেবারেই না থাকা, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে ভর্তি করা (শহরে ছেঁকে ভর্তি করা হয়), ছাত্রছাত্রী বেশি দেখানোর প্রবণতা, খারাপ ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষায় বসাতে প্রভাবশালী চাপ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা, ফরম পূরণের পর শহরে যে নার্সিং করা হয় গ্রামে তা না করা, অভিভাবকের অসচেতনতা ও তদারকির অভাব এবং দারিদ্র্য।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডে সম্প্রতি রাজধানী, রাজধানীর বাইরের শহর এবং গ্রামাঞ্চলের ওপর আলাদা জরিপ পরিচালিত হয় মান আর পাসের বিষয়টি নিয়ে। ওই জরিপে দেখা যায়, ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে ইংরেজিতে মোট ২ লাখ ৮ হাজার ২৯৩ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৭২ হাজার ৫৫৪ জন। পাসের হার ৮২ দশমিক ৮৪ ভাগ। ফেল করেছে ৩৫ হাজার ৭৩৯ জন। আর ২০০৯ সালে একই পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২ লাখ ২৮ হাজার ৩৯৬ জন অংশ নিয়ে পাস করে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯০৬ জন, পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩৯ ভাগ। ফেল করেছে ৫৮ হাজার ৪৯০ জন। পৃথকভাবে ইংরেজি দুটি পত্রের হিসাবে দেখা যায়, ২০০৮ সালে প্রথম পত্রে ৮৭ ভাগ এবং দ্বিতীয় পত্রে ৮২ ভাগ পাস করেছিল। ২০০৯ সালে এসে এ হার প্রথম পত্রে দাঁড়ায় ৮৬ ভাগ আর দ্বিতীয় পত্রে ৭৬ ভাগ। বিপরীত দিকে ২০০৮ সালে গণিতে পাস করেছিল ৯১ ভাগ। ২০০৯ সালে পাস করেছে ৮৭ ভাগ। অর্থাৎ মানের এবং পাসের হার দুটির বিবেচনা নিম্নমুখী। আন্তঃবোর্ডের আহ্বায়ক অধ্যাপক হক বলেন, শহরে-গ্রামে পাসের হার একেবারেই নিম্নমুখী। শহরে ৮৫-৮৮ ভাগ পাস করলেও গ্রামে ৪৪-৫৩ ভাগের বেশি পাস করে না।

রাজশাহী ও সিলেট বোর্ড

এবারের পরীক্ষায় ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ফেল করেছে রাজশাহী বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৭৬২, পাস করেছে ৬৭ হাজার ৩৪৭ জন। অর্থাৎ ৩৬ দশমিক ৩২ ভাগই ফেল করেছে। গত বছর এ বোর্ডে পাস করেছিল ৭১ দশমিক ৩০ ভাগ। এবার পাসের হার ৮ ভাগেরও বেশি কমেছে। অর্থাৎ পাসের নিম্নগতি হয়েছে। গত বছর বা ২০০৮ সালে সিলেট বোর্ডে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৪৫ ভাগ ফেল করেছিল। মোট ২৮ হাজার ১২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার ৬০৭ জন পাস করেছিল। এবার ৩৫ হাজার ৮০৯ জনের মধ্যে ৩০ হাজার ৮০১ জনই পাস করেছে। পাসের হার ৮৬ দশমিক ০১ ভাগ।

অন্যান্য বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে গত বছর ইংরেজিতে ২২ দশমিক ৫৭ ভাগ ফেল করেছিল। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬৮ হাজার ৩৭২ জন আর পাস করে ৫২ হাজার ৯৪২ জন। এবার ২১ দশমিক ৮৩ ভাগ ফেল করেছে। অর্থাৎ ৮৪ হাজার ১১৩ জনের মধ্যে ৬৫ হাজার ৭৪৯ জন পাস করেছে। যশোর বোর্ডে গত বছর ১৯ ভাগ ফেল করে, এবার সেখানে ১৯ দশমিক ৫৩ ভাগ ফেল করেছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে গতবার ইংরেজিতে ৭৮ দশমিক ২৩ ভাগ পাস করে। এবার পাস করে ৮২ দশমিক ৩৪ ভাগ। বরিশাল বোর্ডে গতবার ৭৪ দশমিক ২১ ভাগ পাস করেছিল ইংরেজিতে। এবার ৭৪ দশমিক ৪৪ ভাগ পাস করেছে। আর নবগঠিত দিনাজপুর বোর্ডে এবার ৯৩ হাজার ৯২৭ জনের মধ্যে ফেল করেছে ২৫ হাজার ৬৯৫ জন, যা মোট সংখ্যার ২৭ দশমিক ৩৬ ভাগ।

মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের হার বেশি!

এবার মাদ্রাসা বোর্ডে ইংরেজিতে পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৯ ভাগ। অর্থাৎ, ফেল করার হার মাত্র ৯ ভাগ। গত বছরও সব বোর্ডের মধ্যে এ বোর্ড ইংরেজিতে সেরা ছিল। মোট ১ লাখ ৬২ হাজার ৮৯৬ জনের মধ্যে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৮১১ জনই পাস করেছে। অর্থাৎ ফেলের হার মাত্র ১১ দশমিক ৭২ ভাগ। যেখানে নামকরা প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ ঢাকা বোর্ডেও ফেলের হার প্রায় ২৬ ভাগ, সেখানে মাদ্রাসা বোর্ডের এ পাসের হারকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ জানান, আসলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এখন এ বিষয়ের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। অনেকে দাখিলের পর কলেজে ভর্তি হয়। সেক্ষেত্রে তারা ইংরেজির ওপর চাপ বেশি দিয়ে থাকে। তাছাড়া ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হওয়ার কারণে গ্রামারেই অনেকে পাস নম্বর তুলে নেয়। যে কারণে পাসের হার বেশি মনে হয়। তিনি বলেন, ২০১১ সালে মাদ্রাসায়ও ২০০ নম্বরের ইংরেজি পরীক্ষা হবে।

উদার প্রশ্ন পাস বাড়াতে পারছে না

বোর্ড সূত্র এবং প্রশ্ন প্রণেতারা নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, সাধারণত ৮০ ভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উপযোগিতাকে সামনে রেখে প্রশ্ন প্রণীত হয়ে থাকে। বাকি যে ২০ ভাগ কঠিন প্রশ্ন করা হয়, তা অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষার্থী ছাড়া জবাব দিতে পারে না। এখন প্রশ্ন উঠেছে, এ ২০ ভাগ প্রশ্নই পাস-ফেলে প্রভাব ফেলছে কিনা।